ভার্জিন-২

সত্যব্রত

প্রথম লেখাটি সাতরঙ ওয়েবসাইটে ছাপা হ'লো কি না আগ্রহ ভরে দেখতে গিয়ে দেখি , শ্রদ্ধেয়া সম্পাদিকা লেখার শিরোনামটির সাথে একটি অতিরিক্ত ' -১ ' বসিয়ে দিয়ে তাকে অলংকৃত করেছেন । আর সেই সাথে আমি পেয়ে গেলাম আমার দ্বিতীয় লেখাটির উপকরণ । হ্যাঁ , ভার্জিন-১ এর পর এবার লিখছি ভার্জিন-২ নিয়ে ।

প্রশ্ন জাগছে হয়তো , ভার্জিনতো ভার্জিন ই । ভার্জিন-২ আবার হয় কি করে ? আরে হয় , হয় কি করে যে হয় সেটা একটা মনে পড়া ঘটনার বর্ণনা দিলেই পরিষ্কার হবে ।

আমাদের মধ্যবিত্তের ছোট্ট পাড়াটিতে যে কয়টি বাসায় ভাড়ার ব্যবস্থা ছিল তা আমাদের নখ-দর্পণে ছিল । কোন বাড়িওয়ালার বাসায় নতুন ভাড়াটিয়ে আসা মানেই ; সেই বাসায় কোন সুন্দরী মেয়ে আছে কি না সে বিষয়ে সবার ছিল উৎসুক্য । রাস্তার মোড়ে-মোড়ে পাড়ার ছেলেদের টহল বসতো । নতুন ভাড়াটিয়ে বাসার মেয়েটি বের হওয়ার সাথে সাথেই এ ওকে ধাক্কা দেয় , এ চোখ মারে তো ও নতুন গজানো গোঁফে আঙুল বুলিয়ে দেখায় পৌরষের প্রকাশ । আর কেউ কেউ মেয়েটির পিছু পিছু হেঁটে সুখ পায় ; যতদূর হেঁটে যাওয়া যায় । মেয়েটি রিক্সা পাওয়া পর্যন্ত মোড়ের শেষ মাথায় দুপুরের কড়া রোদ হজম করে সুন্দরী মেয়ে দেখার তৃপ্তি নিয়ে ঘরে ফিরতো পাড়ার উঠতি ছোকরা রোমিওরা । এমনি এক ভাড়াটিয়ার সুন্দরী মেয়ের নাম দরিয়া ; দুনিয়া আলো করা যার রূপের রোশনাই । দরিয়া যে ভাড়া বাসায় উঠলো সে বাসাটির নাম কাঁঠাল গাছ তলার বাসা । অল্প ক'দিন হ'লো বাসাটি দো'তলা করা হয়েছে । নতুন বাসাটিতে ভাড়াটিয়া চলে এসেছে কিন্তু বাড়ির বাইরের দেয়ালে সিমেন্টের পলেস্তার করা বাকি রয়ে গেছে । লাল ইট গুলো সব দাঁত বের করে হাসছে ।

আগে এই কাঁঠাল গাছ তলাটায় ছোকড়াদের জম্পেশ আড্ডা বসতো । কেউ নতুন সিগারেট ধরে হিন্দি ফিল্মের নায়কের স্টাইলে লাইটার জ্বালিয়ে সিগারেট ধরানোর কৌশলটা দেখানোর জন্য , কেউবা গলায় ঘাম ভেজা রুমালের গিঠ্ঠু মেরে এ্যাকশন দেখিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো , আর কেউবা ঐ রাস্তা দিয়ে যাওয়া যুবতী , প্রৌঢ়া আর নব্য যুবতীদের নব-উত্থিত শিমূল কাঁটার মত বুক দেখার লোভে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে পাড় করে দিত দুপুর থেকে বিকেল ।

দরিয়া নামের মেয়েটি যখন দোতলা বাসার নীচ তলায় ভাড়াটিয়া হিসেবে এলো ; এ পাড়া যেন আকাশের চাঁদ ধরায় পেলো । এত সুন্দরী মেয়ে এ পাড়ায় আর দ্বিতীয়টি নেই । মেয়েটির বয়স তখন ৮ কি ৯ ; তা তে কি ; ভার্জিন তো , লাগো সব তার পিছু ।

বিবাহিত পুরুষরা বাজারে যাওয়ার পথে থমকে দাঁড়িয়ে কিছু একটা ফেলে এসেছে এমন ভাণ করে আবার ঐ পথটা মাড়াতো ; মানে সেই কাঁঠাল গাছ তলার বাড়িটার সামনে দিয়ে যাওয়া রাস্তাটি ধরে হেঁটে যেতে যেতে দরিয়াকে যদি একবার জানলায় উঁকি দিতে দেখা যায় ; এই ছিল তাদের আকাঙ্খা ।

তখনও আমাদের বাসায় টি ভি কেনা হয়নি । ছোটদের আসর আর নতুন কুঁড়ি দেখার লোভ সামলাতে পারতামনা বলে কারও না কারও বাসায় টিভি দেখা চাই । আর ঘটনাক্রমে টি ভি দেখার অনুমতি পাওয়া যেত শুধুই ঐ কাঁঠাল গাছ তলার বাসার মালিকের বাসায় । কারন বাড়ির মালিক গোফরান কন্ট্রাকটর আমাদের বাসার লোকজনকে খুব সন্মান আর কদর করতেন । টি ভি নাই বলে যার তার বাসায় গিয়ে মান-সন্মান খোয়ানো যাবেনা ; এই হ'লো মায়ের নির্দেশ । তো কি আর করা ! ছোট ভাইটিকে সাথে করে সকালে গেলাম আতিউর চাচা (গোফরান কন্ট্রাক্টর এর ছেলে যার সাথে আমাদের পারিবারিক সখ্যতা) র বাসায় । দোতলার সিঁড়ি বেয়ে উঠতেই মনোয়ারা ফুপুর জমজ মেয়ে রিতা আর নিতা র সাথে দেখা হয়ে গেলো । দু'জনের-ই গালে টোল পড়ে আর সিঁড়ি কোঠার অন্ধকারের সাথে মিশে যাওয়া তাদের গায়ের রঙ । ওদের সাথে হেসে কুশল বিনিময় সেরে সোজা ঢুকলাম মনোয়ারা ফুপুর ঘরে ।

কুশি কাঁটায় বুনন থমকে ফুপু ছুটে এলেন আমার কাছে । দেখিয়ে দিলেন টি ভি রুম , আর বল্লেন তার দুই মেয়ে তখন প্রাইভেট টিউটরের কাছে পড়বে বলে নিচের তলায় যাচ্ছে ; আমি যেন টিভি রুমে চলে যাই । তড়ি-ঘড়ি করে টি ভি রুমে ঢুকলাম । কারন কুশল বিনিময় পর্ব সারতে গিয়ে ছোটদের ধারাবাহিক নাটক রোজ-রোজ এর দশম পর্বটির অনেকাংশ শেষ হয়ে গেছে ততক্ষনে ।

বেতের চেয়ারের গদিতে আরামে বসে আছেন ফুপা মানে মনোয়ারা ফুপুর বিদঘুটে চেহারার বর ; ঐ বাড়ির একমাত্র মেয়ের জামাতা । তার বসার আয়েশি ভঙ্গিটা ভাল ঠেকলোনা আমার । তার অপর পাশের চেয়ারটায় বসলাম ছোট ভাইটিকে কোলে নিয়ে । আর আমার পাশের চেয়ারটায় বসা ছিলো দরিয়া । এমন মুশকিলে পড়লাম যে টি ভি র দিকে চোখ রাখবো না কি পাশে বসা দরিয়াকে কাছ থেকে দেখার সুযোগটা পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে হা করে চেয়ে থাকবো ; সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলামনা । লক্ষ্য করলাম ফুপার চোখ দরিয়ার দিকে । ৮-৯ বছরের দরিয়ার সেদিকে খেয়াল নেই । টি ভি তে নাটক দেখে

হেসেই অস্থির । আর তার সুন্দর হাসির দিকে লোভী চোখ নিয়ে তাকিয়ে আছেন মোতালেব ফুপা ।

হঠাৎ ফুপা তার জায়গা ছেড়ে উঠে দরিয়ার কাছে এসে ওর পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বল্লেন : আস দরিয়া , আমার কাছে বস । দরিয়ার হাত ধরে ফুপা তার পাশে বসালেন আর তার গাঢ় খয়েরী চুলগুলোতে আঙুল ঢুকিয়ে বিলি কাটতে কাটতে কথা বলতে লাগলেন । আমি মনোযোগ দিলাম নাটকের দৃশ্যে । হঠাৎ খেয়াল করলাম ফুপা দরিয়াকে তার কোলে বসালেন । দরিয়ার বুকটাকে হাতরাতে লাগলেন আর মাঝে মাঝে অশোভনভাবে চাপ দিতে থাকলেন । দরিয়ার মুখ লাল হয়ে গেল । আমি আর টি ভি রুমে বসে থাকতে পারলামনা । ছোট ভাইটিকে কোলে নিয়ে কিছু না বলেই বাসার দিকে রওয়ানা দিলাম । আমি ঐ বাসা থেকে সিঁড়ি বেয়ে নেমে রাস্তাটুকুন পাড় হয়ে যে কি ভাবে বাসায় ঢুকলাম ; কিছুই মনে নেই । শুধু মনে আছে হৃদপিন্ডটা ধুপ্ - ধুপুস্ শব্দ করে যেন বেরিয়ে আসতে চাইছিল ।

১১ বছর বয়েসি সেই আমি ঘটনাটি কাউকেই মুখ ফুটে বলতে পারিনি সেদিন । তবে বুঝতে বাকি রইলোনা ঐ দরিয়াকে যিনি কোলে বসিয়ে অমন অশোভন কাজ করতে পেরেছেন , তিনি দরিয়াকে ভার্জিন-২ বানানোর দারুন দুষ্কর্মটিও কোন এক মোক্ষম সুযোগে করে নিয়েছেন ।

এর পর থেকে আজ অব্দি ঐ বাড়িতে আর কখনও যাইনি । এমনকি কোরবানীর গোশত দিতে যেতে বল্লেও যাইনি ও বাসায় আর । কারন স্মৃতিতে ঘটনাটি এত বেশি ছাপ ফেলেছে যে ঐ বাড়ির প্রতিটি ইট , কাঠ আমার কাছে ঘৃণ্য হয়ে গেছে । মনের ভেতর একটা অস্থিরতা ; দরিয়াকে বদলোকটার খপ্পর থেকে কি করে বাঁচানো যায় । শেষ পর্যন্ত ভয় কাটিয়ে একদিন দরিয়ার মা'র সাথে দেখা করলাম আর বল্লাম দরিয়াকে যেন অন্য কারও বাসায় একা যেতে না দেয়া হয় । আমার কথার কারন বুঝতে না পেরে খালাম্মা শুধু আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন । আমি এর বেশি আর কিছুই বলতে পারলামনা তাকে

এরপর আসা-যাওয়ার পথে মাঝে-মাঝে হঠাৎ-হঠাৎ দরিয়াকে দেখতাম এক ঝলক - হয়তো দোকান থেকে ডিম কিনে বাসায় ঢুকছে কিংবা মাথার ঘোমটা টা ঠিক করে ছোট ভাই-বোনদের গায়ের ধুলো ঝেড়ে ঘরে নিয়ে যাচ্ছে । ভাই বোনদের সবার বড় দরিয়াকেই দোকানে পাঠানোর কি মানে আমার তা বোধগম্য হ'তোনা ।

আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি তখন দেখতাম দরিয়া বৌ এর মত মাথায় বড় ঘোমটা টেনে মুখে এক কৃত্রিম লজ্জার ভাব এনে কি সব ভঙ্গি করে ছেলেদের দিকে তাকিয়ে হাসছে ,পাড়ার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পায়ের স্যান্ডেল ঘষে-ঘষে হাঁটছে আর ঘাড়

বাঁকা করে একবার যুবকদের দিকে নিজের মুখটাকে ঘোমটা ফাঁক করে দেখাচ্ছে আবার যুবকরা যখন ছটফট করছে দরিয়াকে আরেকটু দেখতে তখন ই দু'হাত দিয়ে ওড়নাটা দিয়ে নিজের মুখটা ঢেকে দিচ্ছে । এভাবে প্রায় সময়ই দরিয়াকে দেখতে পেতাম রাস্তায় হেঁটে বেড়াচ্ছে । অবাক হতাম দরিয়ার এমন পরিবর্তন দেখে । দরিয়ার মা বাবা দু'জনই খুব ধার্মিক । দরিয়া এবং তার ছোটবোন লামিয়াকে কখনও মাথায় ঘোমটা ছাড়া চলতে দেখিনি , এমনকি দরিয়া যখন ৮-৯ বছরের ছিলো তখনও না । কিন্ত আমার মনে প্রশ্ন জাগতো , এই যে কৌশর উত্তীর্ণ সদ্য যৌবনা মেয়েটি রাস্তায় এমন ভাবে হাঁটছে- হাসছে , ছেলেরা ওকে দেখে টিপ্পনি কাটছে ; তার বাবা মা কি জানলা দিয়ে একবার ও দেখতে পারেনা মেয়ে কোথায় কি করছে ? আশ্চর্য্য !

দরিয়ার সেই নিষ্পাপ চেহারার এমন আমূল বদলে যাওয়া দেখে কষ্ট পেলাম মনে । আর ধারনা করে নিলাম দরিয়া এখন আর নিষ্পাপটি নেই । এখন সে সেচ্ছায় পাপে জড়িয়েছে । কষ্ট পেলেও তাকে জিইয়ে রাখার পরিস্থিতি আমার ছিলোনা , ছিলোনা প্রেম-ভালবাসা নিয়ে ভাবনা চিন্তায় সময় নষ্ট করার । নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের টানা-পোড়েনের মধ্যে বড় হওয়া সংসারের বড় ছেলের মনে এইসব আবেগ আসা মানায়না ।

মাষ্টার্সের মাঝামাঝিতে খেয়াল করলাম কাঁঠাল গাছ তলায় তরুণ যুবাদের সেই রমরমা জটলাটি আর নেই ,দরিয়াকেও আর দেখা যায়না । দরিয়ার কথা জিজ্ঞেস করে আবার না ফেঁসে যাই 'দরিয়া' নামের মেয়েটির সাথে গুজবের জটিলতায় ; সেই ভয়ে দরিয়া সম্পর্কে কিছু জানা ও হয়ে উঠেনা । একদিন দুপুরে ভাত খেতে খেতে মা' কে শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞেস করে-ই ফেলি দরিয়ার কথা । মা যা শুনালেন তা শুনে আমার চোখ ঝাপসা হয়ে উঠলো জলে ।

দরিয়া এ পাড়ায় আর নেই । ওরা এ পাড়া ছেড়ে কোথায় গেছে তা কেউ জানেনা । তরুণী দরিয়া শেষ পর্যন্ত না কি পাগলী হয়ে গিয়েছিল । ঘরে থাকতে চাইতোনা । বাইরে যেতে না দিলে চিৎকার করে কাঁদতো , বাসার জিনিষ ভাঙচুর করতো । তা'কে না কি বাসায় দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হ'তো । এত সুন্দরী মেয়ে হওয়া স্বত্তেও কেউ দরিয়াকে বিয়ে করতে এগিয়ে এলোনা । দরিয়ার আর বিয়ে হ'লোনা ।

এ ভাবেই সমাজের ভার্জিন-১ রা হয়ে যায় ভার্জিন-২